অতীত ও ঐতিহ্য

অষ্টম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৩

দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪

তৃতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জী
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক *অতীত ও ঐতিহ্য* প্রকাশিত হলো। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য বইটিতে ধাপে ধাপে ভারতের আধুনিক ইতিহাস বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা পরিবেশন করা হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯— এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী *অতীত ও ঐতিহ্য* বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই বইটিতে নানা ধরনের প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সংযোজিত হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ইতিহাস বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, বইটি জুড়ে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে নানা হাতেকলমে কাজের পরিসর রাখা হয়েছে। আশা করি, নতুন পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

অতীত ও ঐতিহ্য বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

মার্চ, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, প্যঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস বইয়ের নাম *অতীত ও ঐতিহ্য*। নতুন পাঠ্যসূচি অনুসারে বইগুলি 'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত। অষ্টম শ্রেণিতে ভারতের আধুনিক সময়ের ইতিহাস-এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় হবে। এই বইতে আখ্যানমূলক বিবরণের পাশাপাশি আধুনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজভাবে ঘটনাবলিকে শিক্ষার্থীর সামনে পরিবেশন করা হয়েছে। একদিকে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে তথ্যভার অতিরিক্ত আকারে শিক্ষার্থীকে বিড়ম্বিত না করে, আবার অত্যধিক সরল করতে গিয়ে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় যোগসূত্রগুলি যেন তার কাছে অস্পষ্ট না হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক অতীত, জাতীয়তাবাদী এবং অন্যান্য আন্দোলনসমূহের বিচিত্র ও জটিল গতিপথগুলি যথাযথ মূর্ত অবয়বে শিক্ষার্থীর সামনে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টাও আমরা করেছি। ইতিহাসের মৌল ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তক যাতে কার্যকর হয়, সেবিষয়ে, বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়-ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এইভাবে শিক্ষার্থী ইতিহাসকে জীবন্ত এবং অর্থবাহী একটি প্রবাহ হিসেবে বিচার করতে শিখবে। বিভিন্ন প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সেকারণেই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই সংযোজিত আছে নমুনা অনুশীলনী-- 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো'। সেগুলির মাধ্যমে হাতে-কলমে এবং স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের চর্চা করতে পারবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে শ্রেণিকক্ষে বইটি ব্যবহার প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব মুদ্রিত হলো। দক্ষ যশস্বী শিল্পীরা বইগুলিকে রঙে রেখায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত এই পাঠ্যপুস্তকটি ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

মার্চ, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা তত্ত্বাবধান

শিরীণ মাসুদ (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

পাণ্ডুলিপি নির্মাণ এবং পরিকল্পনা ও সম্পাদনা-সহায়তা

অনির্বাণ মণ্ডল
কৌশিক সাহা
গৌতম বিশ্বাস
প্রদীপ কুমার বসাক
প্রবাল বাগচি
সত্যসৌরভ জানা
সহিদুর রহমান
সুগত মিত্র

গ্রন্থসজ্জা

প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্র : দেবব্রত ঘোষ

মানচিত্র নির্মাণ : হিরণ্ময় ঘোষ

মুদ্রণ সহায়তা : অনুপম দত্ত , বিপ্লব মণ্ডল ও ধীমান বসু

বিশেষ সহায়তা

তিস্তা দাস পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ দেবাশিস রায়

****

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ইতিহাসের ধারণা	১
২. আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	৪৪
৩. ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা	১৩২
৪. ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র	১৯৭
৫. ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া : সহযোগিতা ও বিদ্রোহ	২৮১

৬. জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশ ৩৬১
৭. ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও বিবর্তন ৪৫১
৮. সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশভাগ ৫৩৯
৯. ভারতীয় সংবিধান : গণতন্ত্রের কাঠামো ও জনগণের অধিকার ৫৮৯
o ভারত-ইতিহাসের সালতামামি
o শিখন পরামর্শ

১ ইতিহাসের ধারণা

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে এই যুগটা বিজ্ঞানের যুগ। অর্থাৎ রোজকার জীবনযাপনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দরকার হয়। এমনকী কথাবার্তার মধ্যেও নানা বৈজ্ঞানিকতার ছোঁয়া থাকে। তাহলে বিজ্ঞানের যুগে আজও স্কুলে ইতিহাস বই পড়ানোর দরকারটা কী? এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই তোমাদের কারো কারো মনে আসে। সত্যি যে ইতিহাস পড়ে কী লাভ হয়, তা বোঝা মুশকিল। কেবল পুরোনো দিনে কবে, কে, কী করেছে তার খতিয়ান।

গঙ্গা নদী-সংলগ্ন চাঁদপাল ঘাট থেকে এসপ্লানেড চত্বরের দৃশ্য। মূল রঙিন ছবিটি জেমস বেইলি ফ্রেজার-এর আঁকা (১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ)।

তার উপরে ঘটনাগুলো ঘটে আগে আগেই। ফলে ঘটনা ফলাফলগুলোও জানা। অথচ সেই নিয়ে কত তর্ক-বিতর্ক। নানারকম মতামত। যদি ঘটনাগুলো ও সেসবের ফলাফল জানাই থাকে, তাহলে কীসের এত তর্ক? একটু খতিয়ে দেখা যাক তবে।

ইতিহাস বলতে খালি রাজা-সম্রাট-যুদ্ধ-রাজস্বনীতির কথা পড়তে কেবল তোমাদেরই একঘেয়ে লাগে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও একঘেয়ে লাগত। দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের এবিষয়ে বক্তব্য কী?

ভারতবর্ষের ইতিহাস : রবীন্দ্রনাথের চোখে

‘‘ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র।

কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর-একদল উঠিয়া পড়ে পাঠান-মোগল-পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

..... ভারতবাসী কোথায়, এ সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনোখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।

..... সেইজন্য বিদেশির ইতিহাসে এই ধূলির ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না।....

.....

যে-সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্‌টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদগার-কাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা; তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়।....”

ভালো করে পড়লে দেখতে পাবে ইতিহাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সমস্যা নেই। বরং সেই ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি প্রশ্ন করছেন? সেইসব প্রশ্নের মধ্যে যেটা বড়ো হয়ে উঠছে, তা হলো ভারতের ইতিহাস কে বা কারা লিখবে? বিদেশি ঐতিহাসিক? নাকি ভারতীয়দের নিজেদেরই লিখতে হবে তাদের ইতিহাস?

ফাররুখশিয়রের স্বর্ণমুদ্রা

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু বছর আগে একইরকম প্রশ্ন তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরও বক্তব্য ছিল বাঙালির ইতিহাস চাই। অর্থাৎ বাঙালি জাতির অতীতের কথা বাঙালিকে জানতে

হবে। না জানলে আর রক্ষা নেই। কিন্তু কেন রক্ষা নেই? কীজন্য ইতিহাস জানা নিয়ে এত ভাবনা-চিন্তা?

আজ যা দেখা যাচ্ছে, যা ঘটছে, এককথায় এই আজ অর্থাৎ বর্তমানটা এসেছে ইতিহাস থেকে। অর্থাৎ বর্তমান কেমন হবে, তা ঠিক হয়ে যায় অতীত থেকেই। বর্তমানের নানা কাজের যুক্তি খুঁজে বার করা হয় অতীত থেকে। সেই নেকড়ে ও ছাগলছানার গল্পটা মনে আছে।

হায়দর আলির স্বর্ণমুদ্রা

ছাগলছানা গেছে জল খেতে। নেকড়ে তাকে ধরেছে। ছাগলছানা যত জানতে চায় তার কী দোষ। নেকড়ে তাকে শোনায় তার পূর্বপুরুষ কী

কী অপরাধ করেছিল। নেকড়ের যুক্তি ছিল, ছাগলছানাকে তার পূর্বপুরুষের করা অপরাধের শাস্তি পেতে হবে। অর্থাৎ, ছাগলছানার প্রতি নেকড়ের বর্তমান আচরণের যুক্তি লুকিয়ে আছে ইতিহাসে।

এবারে নেকড়ের জায়গায় বসানো যাক ভারতে ব্যবসা করতে আসা কোনো নীলকর সাহেবকে। আর ছাগলছানার জায়গায় বসানো যাক গরিব নীলচাষিকে। প্রায় সবসময়ই দেখা যেত নীলকর সাহেবের কাছে চাষির টাকা ধার আছে। সেই ধার বংশগত ধারে পরিণত হতো। ফলে চাষিকেও নীলচাষ করে যেতে হতো। যুক্তিটা একই। তোমার পূর্বপুরুষের করা কাজের ফল তোমায় ভোগ

করতে হবে। তাহলে ফল যখন ভোগ করতেই হবে, তখন পূর্বপুরুষের করা কাজের খতিয়ানও জানা দরকার। তাই ইতিহাস পড়তে হবে।

সাদাৎ খানের স্বর্ণমুদ্রা

আর একটা ঘটনা ঘটতে পারে। ধরা যাক নেকড়ে একজন যুক্তিবাদী। তাহলে ছাগলছানা যদি তার ইতিহাস ঘেঁটে দেখাতে পারে যে নেকড়ের যুক্তি ঠিক নয়, তাহলে নেকড়ে হয়তো তাকে ছেড়েও দিতে পারে। অর্থাৎ, ইতিহাস ঘেঁটে আবার দোষ কাটানোও যায়। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। তার মানে ইতিহাস থেকে যুক্তি নিয়ে নেকড়ে যেমন ছাগলছানার উপর অত্যাচার করতে পারে। তেমনি, ছাগলছানাও ইতিহাস ঘেঁটে

প্রমাণ করতে পারে যে সে নির্দোষ। বা সে আদপেই ঐ বংশের ছাগল নয়। নেকড়ের ভুল হয়েছে।

আবার একবার নেকড়ের জায়গায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসককে বসানো যাক। আর ছাগলছানার জায়গায় সাধারণ ভারতীয় জনগণ ধরা যাক। ব্রিটিশশাসক ভারতে উপনিবেশ তৈরি করার যুক্তি দিল, ভারতবাসী তো অসভ্য। তাদের দেশে শিক্ষার অভাব, বিজ্ঞানের অভাব, ইত্যাদি প্রভৃতি। আর ব্রিটিশরা সভ্য। তাই প্রতিটি সভ্য ব্রিটিশের কর্তব্য 'অসভ্য' ভারতীয়দের 'সভ্য' করা। তার জন্য ভারতে ব্রিটিশ-শাসন কায়েম করা দরকার। এই যুক্তির নিরিখে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তৈরি হলো।

কোম্পানি-প্রবর্তিত মুদ্রা

কিন্তু,ভারতীয়রা এই যুক্তি মেনে নিল না। তারাও পালটা বলল, কে বলেছে আমরা অসভ্য? তারপর একে একে সম্রাট অশোক থেকে সম্রাট আকবরের কথা এল। আর্যভট্ট থেকে চৈতন্যদেবের কথা এল। আর সেসবের ফলে প্রমাণ করা হলো যে, ভারতেরও 'সভ্যতা' ছিল। সেই সভ্যতা ব্রিটিশ সভ্যতার থেকে খাটো নয়। তাই ব্রিটিশদের ভারতে সাম্রাজ্য বাড়ানোর দরকার নেই। এই যে ভারতীয়রা পালটা যুক্তি দিল, তা কিন্তু ইতিহাস থেকেই। তারা ভেবেছিল, ব্রিটিশরা যেহেতু ইতিহাস ঘেঁটে ভারতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুক্তি দিচ্ছে, তেমনি পালটা যুক্তিও তারা বুঝবে।

অর্থাৎ, ইতিহাস শুধু রাজা-সম্রাটদের নাম, সাল-তারিখ বা যুদ্ধের বর্ণনা নয়। ইতিহাসের মধ্যে মিশে আছে নানান যুক্তি-তর্কের খতিয়ান। ইতিহাসের সাক্ষ্য হাজির করে নিজের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক করা যায়। তার জন্য দরকার ইতিহাস জানা। তাহলে, কেন এখনও স্কুলে ইতিহাস পড়ানো হয় তার আন্দাজ পাওয়া গেল?

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নাম খোদাই করা ফরাসি মুদ্রা

এবারে আসা যাক, দ্বিতীয় প্রশ্নে। ঘটনা আর তার ফলাফল যখন জানাই আছে, তখন কেন ইতিহাসে এত তর্ক-বিতর্ক? আবারও রবীন্দ্রনাথের লেখাটা ফিরে পড়া যাক। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন স্পষ্ট

করে যে, সব দেশের ইতিহাস এক নয়। তাই সাহেব ঐতিহাসিক ভারতের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, ভারতের ইতিহাস আর ইংল্যান্ডের ইতিহাস আলাদা। অর্থাৎ, দ্বিতীয় জরুরি প্রশ্নটা হলো ইতিহাস কে লিখছে বা কে খুঁজছে?

আবারও বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় ফেরা যাক। বাঙালির ইতিহাস চাই বলেই তিনি থেমে থাকেন নি। তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন বিদেশিদের লেখা বাঙালির ইতিহাস ভুলে ভরা। তাই বাঙালির ইতিহাস লিখতে হবে বাঙালিকেই। আর সেই বাঙালি কে? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আমি, তুমি, যে পারবে সবাই। এর থেকে বোঝা

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নাম খোদাই করা মুদ্রা। বাংলা প্রেসিডেন্সির থেকে প্রচলিত।

যাচ্ছে যে, কেন একই ঘটনা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়? কোনো ঘটনাকে দেখার ভঙ্গি বদলে গেলেই, ঘটনার ও তার ফলাফল নিয়ে নানা মতামত তৈরি হয়। সেই যে একরকম ছবি হয়, যাকে নানা কোণ থেকে দেখলে নানারকম ছবি দেখা যায়। আসলে একটাই ছবি। কিন্তু, তার মধ্যে রয়েছে আরো নানা ছবির উপাদান। ঠিক তেমনই মূল ঘটনা ও তার ফলাফল জানা। তবুও, কেন ঐ ঘটনা ঘটল, তার ফলাফল কী হলো — তা নিয়ে বিতর্ক।

অতএব, প্রথম প্রশ্নদুটোর উত্তর পাওয়া গেল। শুধু বাকি একটাই কথা। এই যে বঙ্কিম বলেছেন,

আধুনিক যুগের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রেও মুদ্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

আমি, তুমি সবাই মিলে আমাদের ইতিহাস লিখব— এই কথাটা শুনতে বেশ ভালো। তবে যে সমাজে একটা বড়ো অংশ লোক লেখাপড়ার আওতায় পড়েন না, তাঁরা কীভাবে তাঁদের ইতিহাস লিখবেন? তাহলে কী সবার হয়ে ইতিহাসটা শেষ পর্যন্ত আমিই লিখব? যদি লেখাপড়া জানার নিরিখে বলতে হয়, তাহলে সেই কাজটা সবার হয়ে আমাকেই করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে তাহলে, আমি যেভাবে সবাইকে দেখছি সেটাই লেখা হবে। অর্থাৎ, আমার বিচার অনুযায়ী লেখা ইতিহাস হয়ে উঠবে 'আমাদের ইতিহাস'। ঠিক সেই কারণেই ভারতের ইতিহাসও আসলে কিছু শিক্ষিত মানুষের বিচার অনুযায়ী লেখা ইতিহাস। তাই সেখানে সিধু-কানহু ছাড়া

সাঁওতাল বিদ্রোহে যোগ দেওয়া মানুষদের নাম বিশেষ জানা যায় না। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে আন্দোলন করা অসংখ্য মানুষের নাম জানা যায় না। খালি বলা হয় হাজার হাজার সাঁওতাল বা হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ, নাম নয়, শুধু সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয় সেই মানুষগুলোকে। কেন এমন হয়? কারণ, যিনি বা যাঁরা সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস লিখেছেন, তাঁদের চোখে কেবল সিধু-কানহুর নামই যথেষ্ট। মহাত্মা গান্ধি বা সুভাষচন্দ্র বসুই জরুরি। তাঁদের কথা জানলেই হয়ে যায় ইতিহাস জানা। বাকি যারা, তারা তো কেবল হাজার হাজার মানুষ। তাদের আলাদা করে নাম জানার দরকার নেই। আছে কী?

তাহলে, শুধু নিজেদের ইতিহাস নিজেরা লিখলেই যে সব সমস্যা মিটে যাবে, তা কিন্তু নয়। সবসময়ই

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, মালওয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে চিনে আফিম রফতানি করত। সেই আফিম রফতানি নিয়ে চিনের সঙ্গে ব্রিটেনের সংঘাত ও শেষে যুদ্ধ হয়েছিল। এই ছবিটি চিনের ক্যান্টন প্রদেশে ইওরোপীয় ফ্যাক্টরির ছবি। মূল রঙিন ছবিটি উইলিয়ম দানিয়েল-এর আঁকা (১৮০৫-'১০ খ্রিস্টাব্দ)। এই ধরনের ছবিগুলিও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

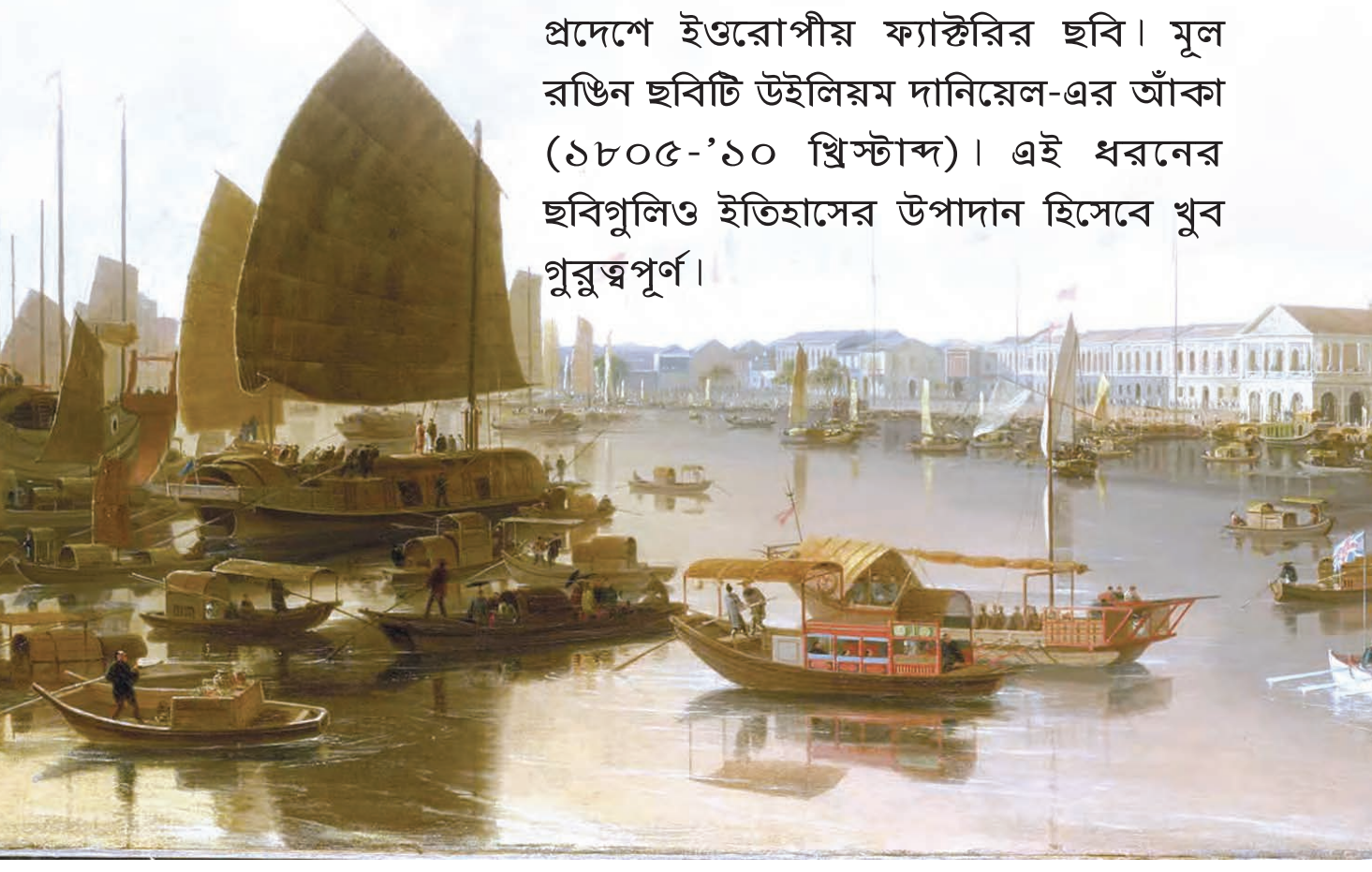

যিনি বা যাঁরা লিখছেন, তিনি বা তাঁরা যেভাবে কোনো ঘটনা দেখছেন বা বুঝছেন সেভাবেই লিখছেন ইতিহাস। আর ব্যক্তি বদলে গেলে যেহেতু দেখার চোখ ও

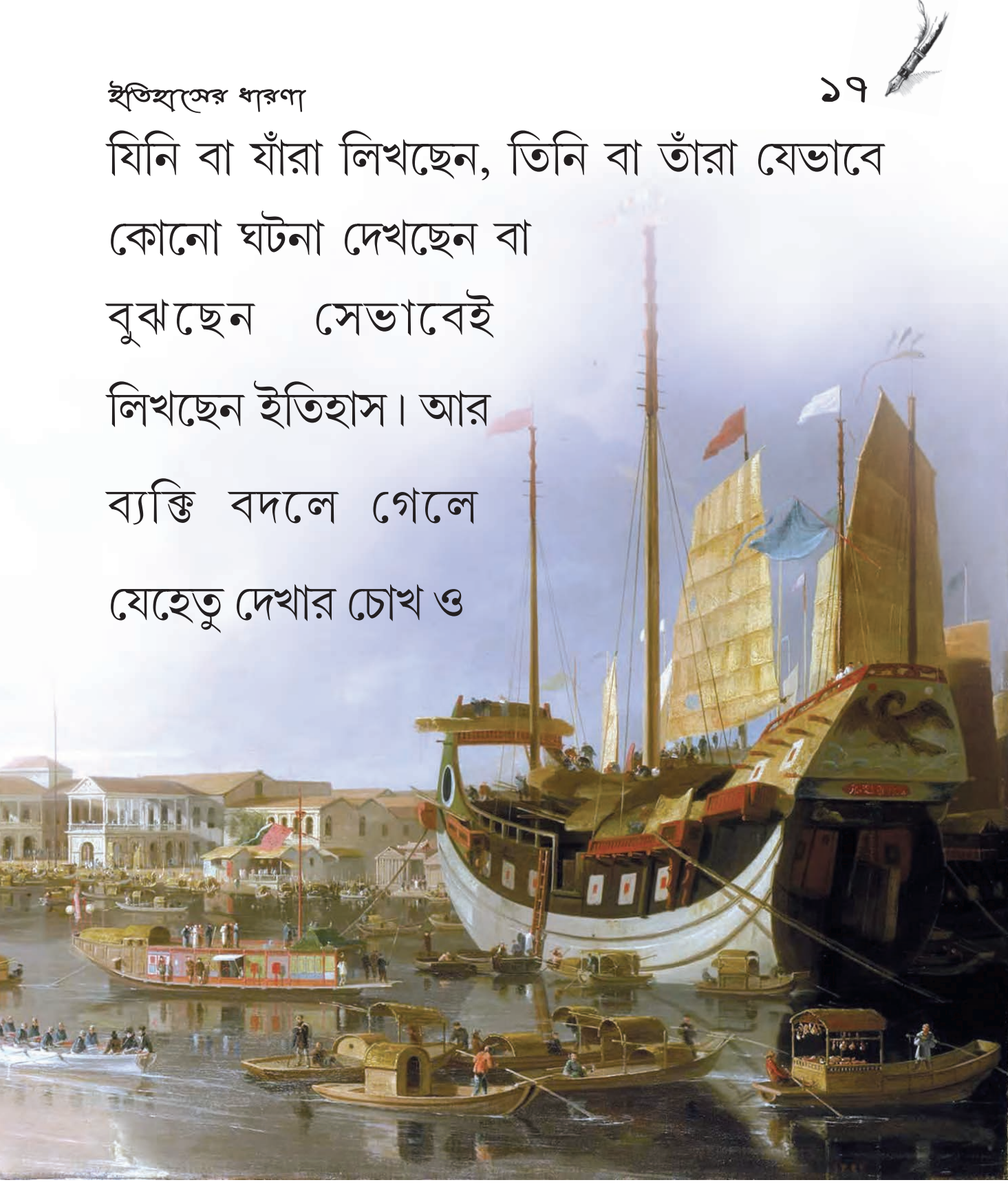

মন বদলে যায়, তাই একই ঘটনা ও তার ফলাফল নিয়ে এত তর্ক-বিতর্ক। এই তর্ক-বিতর্ক হয় বলেই ইতিহাস পড়াটা মজার। নয়তো তা খালি কতগুলো ঘটনা আর তার ফলাফলের খতিয়ান হয়ে থাকত। তা হয় না বলেই ইতিহাসের মধ্যে টান থাকে। ইতিহাস নিয়ে টানাটানিও চলে সেই জন্যে। নিজের বা নিজেদের যুক্তি যে ঠিক, তা প্রমাণের জন্য ইতিহাস ধরে দড়ি টানাটানির লড়াই চলতেই থাকে।

ভারতের ইতিহাসে যুগ বিভাগের সমস্যা

এই যে ইতিহাস বইটা তোমার হাতে আছে, এটা দেখে অনেকে বলবেন, এটা আধুনিক ভারতের ইতিহাস। কেন? কারণ এতে পলাশির যুদ্ধ থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের কথা আছে। ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের শুরু ও শেষ হওয়ার কথা আছে। এসব বিষয় তো আধুনিক ভারতের ইতিহাস। তার আগে ছিল ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস। আরও আগে প্রাচীন যুগের কথা। অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসে তিনটে ভাগ পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক।

'আধুনিক' শব্দটা এসেছে অধুনা থেকে। এর মানে বর্তমানকাল, সম্প্রতি বা নতুন। আর সম্প্রতি কিংবা বর্তমানে ঘটেছে যে ঘটনা তাই আধুনিককালের ঘটনা। সেভাবে দেখলে সত্যিইতো কলিঙ্গ যুদ্ধ এই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় অনেক আগে ঘটেছে। তার অনেক পরে ঘটেছে পানিপতের প্রথম যুদ্ধ। তারও অনেক পরে ঘটেছে পলাশির যুদ্ধ। তাই সময়ের হিসাবে পলাশির যুদ্ধ তুলনায় কম অতীত। তাই সেটা খানিকটা 'আধুনিক'। আর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে সময় যত এগিয়েছে, ততই আরো 'আধুনিক' হয়ে উঠেছে ভারতের ইতিহাস।

কিন্তু এভাবে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক — এই তিনভাগে ভারতের ইতিহাসকে ভাগ করা শুরু হলো কবে? ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়

বিদ্যালঙ্কার রাজাবলি নামে একটি ইতিহাস বই লিখেছিলেন। ভারতের ইতিহাস লিখতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় সময় গোনা শুরু করেছিলেন মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠিরের কাল থেকে। শেষ পর্যন্ত রাজাবলি কলিযুগের সময়ে এসে শেষ হয়। আজ কেউ ইতিহাস লিখতে গিয়ে 'কলিযুগের ইতিহাস' শব্দ ব্যবহার করবেন না। কিন্তু উনিশ শতকের একেবারে গোড়ায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাই করেছেন। তাছাড়া রাজাবলিতে প্রায় সব ঘটনার পিছনেই নানা অদ্ভুত সব যুক্তি রয়েছে। রাজাদের কথা বলার জন্যই রাজাবলি লেখা। কিন্তু সেইসব রাজাদের কাজগুলোকে যেন চালায় কোনো অদৃশ্য শক্তি। রাজারা কেবল তাদের কৃতকাজের ফল ভোগ করেন।

আজ যেসব ইতিহাস বই লেখা হয়, তাতে অবশ্য এধরনের কথা বলা হয় না বরং বিভিন্ন ঘটনার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা যুক্তি হাজির করা হয়। তাহলে রাজাবলি-র ইতিহাস লেখার ছকটা কীভাবে বদলাল?

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে History of British India নামে ভারতের ইতিহাস লেখেন জেমস মিল। বইটা লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অতীতকথাকে এক জায়গায় জড়ো করা। যাতে সেটা পড়ে ভারতবর্ষ বিষয়ে সাধারণ ধারণা পেতে পারে ব্রিটিশ প্রশাসনে যুক্ত বিদেশিরা। কারণ, যে দেশ ও দেশের মানুষকে শাসন করতে হবে, সেই দেশের ইতিহাসটাও জানতে হবে।

অর্থাৎ, ভারতবাসীর প্রতি ব্রিটিশ প্রশাসনের আচরণের যুক্তি নাকি লুকিয়ে আছে ইতিহাসে। সেই আগের নেকড়ে ও ছাগলছানার গল্পটার মতো।

তাঁর ঐ বইতে মিল ভারতের ইতিহাসকে তিনটে ভাগে ভাগ করলেন। সেগুলো হলো— হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ। প্রথম দুটো কালপর্যায় শাসকের ধর্মের নামে। আর শেষটা শাসকের জাতির নামে। তাই শেষটা খ্রিস্টান যুগ হলো না, হলো ব্রিটিশ যুগ। অর্থাৎ ধর্ম নয়, জাতির পরিচয়েই ব্রিটিশ সভ্যতা পরিচিত হতে চায়। আধুনিক হতে হলে ধর্মের বদলে জাতির পরিচয়ের দরকার। তার সঙ্গে মিল লিখলেন যে, মুসলিম যুগ ভারত-ইতিহাসে 'অন্ধকারময়' যুগ। পাশাপাশি

হিন্দু যুগ বিষয়েও মিল অশ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। মিলের লেখা ইতিহাস থেকে দুটো বিষয় তৈরি হলো। প্রথমত, ভারত ইতিহাসের যুগ ভাগ করা শুরু হলো শাসকের ধর্মের পরিচয়ে। আর মিল ধরে নিলেন প্রাচীন ভারতের সব শাসকই হিন্দু। তাই জৈন ধর্মাবলম্বী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিম্বিসারের ইতিহাসও ঢুকে পড়ল হিন্দু যুগের ইতিহাসে। একইভাবে মধ্যযুগের সব শাসককেই মিল মুসলমান ধর্মের সঙ্গে একাকার করে দিলেন। ফলে মুঘল সম্রাট আকবরের মতো উদার শাসকও নিছক ধর্মের পরিচয়ে আটকা পড়লেন। দ্বিতীয়ত, ভারতের ইতিহাসকে মিল তিনটে ধাপের ছকে বেঁধে দিলেন। হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ। ধীরে ধীরে সেই তিনটে ধাপ নাম বদলে হয়ে গেল প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। বছর বছর

এই ধাঁচেই চলল ভারতের ইতিহাস চর্চা। সেজন্য পলাশির যুদ্ধ বা মহাত্মা গান্ধির আন্দোলন— সব কিছুকেই আধুনিক ভারতের ইতিহাসের খোপে ফেলে দেওয়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, এভাবে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক-এর ছাঁচে ফেলে ইতিহাস দেখাটা সমস্যার। রবীন্দ্রনাথের কথাটা আবার দেখা যাক। সব দেশের ইতিহাস যে একই রকম হতে হবে তার

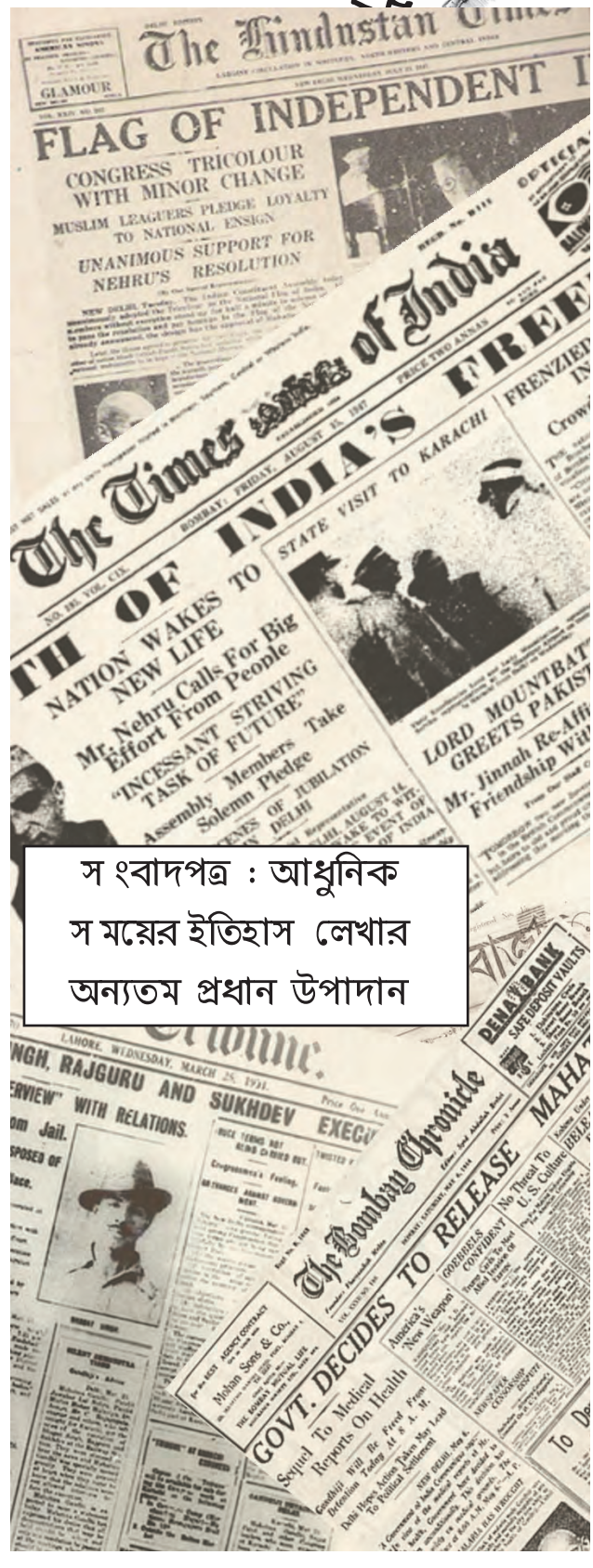

সংবাদপত্র : আধুনিক সময়ের ইতিহাস লেখার অন্যতম প্রধান উপাদান

মানে নেই। ঔরঙ্গজেব মারা গেলেন ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সময়কালকে সাধারণত ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগে ফেলা হয়। তার মাত্র অর্ধশতক পরে পলাশির যুদ্ধ হয় (১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)। পলাশির যুদ্ধকে ফেলা হয় ভারত-ইতিহাসের আধুনিক পর্বে। অথচ বাংলার নবাবি শাসনের আদবকায়দাগুলো মুঘল প্রশাসন থেকেই নেওয়া হয়েছিল। এমনকী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও তাদের শাসনকালের প্রথমদিকে মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থাই বহাল রেখেছিল। তাহলে কোন যুক্তিতে ঔরঙ্গজেব মধ্যযুগে পড়বেন আর সিরাজ উদ-দৌলা বা লর্ড ক্লাইভ পড়বেন আধুনিক যুগে?

আরেক দিক থেকেও বিষয়টা দেখা যায়। সুলতান ইলতুৎমিস যখন মারা যান, তখন মেয়ে রাজিয়াকে

দিল্লির শাসনভারের জন্য নির্বাচন করে যান। যথাক্রমে রাজিয়া সুলতান হন। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকে বা তার পরেও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল বা প্রশাসনিক কর্তার পদে কোনো নারীর খোঁজ পাওয়া যায় না। এখন নারীর শাসনক্ষমতার নিরিখে বিচার করলে কোনটা আধুনিক আর কোনটা আধুনিক নয়? শুধু আগে জন্মেছেন বলেই কী সুলতান রাজিয়াকে মধ্যযুগের বৃত্তে পড়তে হবে?

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক পর্বে ভেঙে ভারত-ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টার মধ্যে প্রায়ই অতিসরলীকরণ আছে। 'যুগ' বলতে একটা বড়ো সময়কে বোঝায়। প্রতিটি যুগের মানুষ ও তার জীবনযাপনের নানারকম বৈশিষ্ট্য থাকে।

সেই বৈশিষ্ট্যগুলি রাতারাতি পালটে যায় না। তাই সবসময় যুগ বদলের ধারাকে সময়ের হিসাব কষে ধরে ফেলা যায় না।

আর একটা জরুরি কথা হলো ইতিহাস থেকে বর্তমানের দূরত্ব। এই দূরত্ব সময়ের হিসাবে যত বেশি হবে, ইতিহাসের বিষয় নিয়ে বাদ-বিতর্কের চরিত্র ততই বদলাবে। যেমন, সম্রাট অশোকের ভাবনাচিন্তায় কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রভাব কী? এই নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও, সেই বিষয়টা মানুষের প্রতিদিনের জীবনে আজ আর তত প্রাসঙ্গিক নয়। তাই তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের

মধ্যে বিতর্ক থাকলেও, সামাজিকভাবে সেই বিতর্ক ততটা জরুরি নয়।

পানিপতের প্রথম যুদ্ধ বিষয়েও কথাটা খানিকটা একইরকম বলা যায়। কিন্তু প্রশ্নটা যদি ওঠে যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভাজন কী

কোনোভাবেই ঠেকানো যেত না? তাহলে প্রশ্নটা সামাজিকভাবেও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আজও ভারতবর্ষের অনেক মানুষ ঐ সময়ের দেশভাগের স্মৃতিতে কষ্ট পান। হয়তো তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে দেশভাগ নানারকম ছাপ ফেলেছিল। ফলে, প্রশ্নটা এক্ষেত্রে অনেক সরাসরি বর্তমান সমাজকে ছুঁয়ে যায়। তাই এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে

ঐতিহাসিকদের মধ্যেও নানা বিতর্ক রয়েছে। তেমনি সাধারণ মানুষেরও নানা বক্তব্য থাকা স্বাভাবিক। ফলে দেশভাগ বিষয়ে ইতিহাস লিখতে গেলে খুব নির্লিপ্তভাবে লেখা কঠিন। অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে ইতিহাসের বিশ্লেষণে প্রায়শই ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত মতামত ও ভাবনাচিন্তা বেশি বেশি করে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ইতিহাসের সময় যত দূরের হয়, সেই সম্ভাবনা তত কমে।

ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাসের উপাদান

আধুনিক ইতিহাস লেখার জন্য উপাদানও নানারকম। বর্তমানের তুলনায় আধুনিক ইতিহাসের সময়টা অনেক কাছাকাছি বলে বিভিন্ন

আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মানে জাপান-কর্তৃক প্রবর্তিত ডাক টিকিট। আধুনিক সময়ের ইতিহাস লেখার অন্যতম উপাদান হল ডাক টিকিট।

উপাদান এখনও হাতের কাছে পাওয়া যায় । গত চার-পাঁচশো বছরের কাগজপত্র, বই , আঁকা ছবি এখনও ততটা নষ্ট হয়নি। তাছাড়া নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেইসব উপাদানকে রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা গেছে। সব মিলিয়ে পৃথিবী জুড়েই আধুনিক সময়ের ইতিহাস লেখার উপাদানের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। ভারত-ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রশাসনিক কাগজপত্র, বই, ডায়েরি, চিঠি থেকে শুরু করে জমি বিক্রির দলিল বা রোজকার বাজারের ফর্দ — সবই ইতিহাসের উপাদান। আবার ছবি,

মানচিত্র, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র--- কতরকমের জিনিস ব্যবহার হয় ইতিহাস লেখার কাজে।

তবে বিভিন্ন উপাদান বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে হয়। ধরা যাক, কারো আত্মজীবনী থেকে তাঁর সময়ের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সোজাসুজি সেই আত্মজীবনী ব্যবহার করলেই হবে না। কারণ, যিনি আত্মজীবনী লিখছেন, তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারা থেকেই সব কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। ঐতিহাসিক যদি সেই ব্যাখ্যা পুরোপুরি মেনে নেন বিচার না করেই, তাহলে একপেশে হয়ে যায় বক্তব্য। কখনও বা পুরো ভুল সিদ্ধান্তেও পৌঁছে যেতে পারেন ঐতিহাসিক। যেমন, উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন তাঁর লেখা অ্যালান

অক্টোভিয়ান হিউমের জীবনীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব হিউমকেই দিয়েছেন। অথচ পরে দেখা গেছে যতটা কৃতিত্ব হিউমকে দেওয়া হয়, আদৌ ততটা কৃতিত্বের দাবিদার হিউম নন। ঐতিহাসিক যদি শুধু ওয়েডারবার্নের কথাই মেনে নিতেন, তাহলে এই নতুন বিশ্লেষণ পাওয়া যেত না। অর্থাৎ, সমস্ত উপাদানকেই প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে ভেঙেচুরে দেখতে হয় ঐতিহাসিককে।

ভারত-ইতিহাসের আধুনিক পর্বের বিষয়ে জানার অন্যতম উপাদান ফোটোগ্রাফ। অর্থাৎ ক্যামেরায় তোলা ছবি। এইরকম ছবির অনেক সংগ্রহ থেকে সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক কিছু জানা যায়। তবে ফোটোগ্রাফগুলিও পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক নয়। মানে আত্মজীবনী বা

জীবনীর ক্ষেত্রে লেখক নিজের ইচ্ছামতো লিখতে পারেন। তেমনি ছবি যিনি তুলছেন, তাঁর দেখার উপরেই ক্যামেরার দেখা নির্ভর করে। ফলে

নীচের ছবিটা ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তোলা একটি ফটোগ্রাফ। ছবিতে গান্ধি ও সুভাষ হাস্যমুখর আলাপে ব্যস্ত। অথচ ঐ সময়ে নানা প্রসঙ্গে দু-জনের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। এমনকি পরের বছর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-সভাপতির পদ ত্যাগ করেছিলেন। অথচ এই ছবি থেকে সেই সময়ে ঐ দুজনের সম্পর্কের সংঘাত বোঝা যায় না। ফলে ফটোগ্রাফের পিছনের ইতিহাস জানা না থাকলে, ফটোগ্রাফ নিজে সবসময় ঠিক মনোভাব প্রতিফলিত করে না।

একই বিষয়ের দু-জনের তোলা দুটি ছবির দু-রকম অর্থ দাঁড়াতে পারে।

প্রশাসনিক নথিপত্রের ক্ষেত্রেও এই দেখার পার্থক্যটা বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ব্রিটিশ সরকারের চোখে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ-আন্দোলনগুলি প্রায়শই 'হাঙ্গামা' বা 'উৎপাত' বলে ধরা পড়েছে। তাদের লেখা সরকারি নথিপত্রেও তেমনি বিশ্লেষণ চোখে পড়বে। অথচ ঐ আন্দোলনগুলি ভারতে ঔপনিবেশিক শক্তি-বিরোধী আন্দোলন হিসাবে দেখলে সেগুলির অন্য মাত্রা চোখে পড়বে। তখন তিতুমির, বিরসা মুন্ডা, সিধু-কানহু-রা কোনো অংশেই আর 'হাঙ্গামাকারী' নন, বরং স্বাধীনতা সংগ্রামী।

এর থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে, ইতিহাসকে দেখা বা বিশ্লেষণ করাটা নির্ভর করে দেখার ও বোঝার ভঙ্গির উপরে। আর সেই দেখার ও বোঝার ভঙ্গির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা কিছু। সেইসবের মধ্যে সাম্রাজ্যের স্বার্থ, উপনিবেশ বিস্তারের আগ্রহ বা জাতীয়তাবাদের আদর্শ থাকতে পারে। তাহলে বোঝা দরকার সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ কাকে বলে।

সাম্রাজ্যবাদ একটি প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি শক্তিমান দেশ অথবা রাষ্ট্র আরেকটি তুলনায় দুর্বল দেশ অথবা রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে তাকে নিজের দখলে আনে। দুর্বল দেশটির অথবা রাষ্ট্রের জনগণ, সম্পদ সব কিছুকেই শক্তিমান দেশ অথবা রাষ্ট্রটি নিজের প্রয়োজনমতো পরিচালনা করে। এর ফলে শক্তিমান

যখন তার অধীন দুর্বলের ইতিহাস খুঁজতে যায়, তখন জেমস মিলের মতো পরিস্থিতি হয়। দুর্বলের ইতিহাসকে কেবল খাটো করে দেখার প্রবণতা থাকে। বলা শুরু হয়, দুর্বল শুধু দুর্বল নয়, অসভ্যও, তাই তার ইতিহাস নেই। কারণ ইতিহাস কেবল সভ্য মানুষের হয়। ফলে ইতিহাসহীন অসভ্য মানুষগুলো যাতে সভ্য হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যেই রেখে দেওয়া ভালো।

পাশের ফটোগ্রাফটি বোম্বাইয়ের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের। ছবিতে ব্যক্তিদের (পুরুষ ও নারী) পোশাক, দাঁড়ানোর/বসার ভঙ্গি প্রভৃতি থেকে যাঁদের ছবি তোলা হচ্ছে, তাঁদের মনোভাব, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান প্রভৃতি বোঝা যায়। অতএব সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফের গুরুত্ব অপরিসীম।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে উপনিবেশবাদের যোগাযোগ স্পষ্ট। ধরা যাক ভারতের অর্থনীতি একসময়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ মোতাবেক চলতো। বাংলায় নীল চাষ করা হতো ইংল্যান্ডের কাপড় কলে নীলের চাহিদা মাথায় রেখে। তাতে করে বাংলার ধান, পাট প্রভৃতি চাষ নষ্ট হতো। বাংলায় অনাহার, দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। এই যে একটি অঞ্চলের জনগণ ও সম্পদকে অন্য একটি অঞ্চলের স্বার্থে ব্যবহার করা এটাই উপনিবেশেরও মূল কথা। ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসাবে ভারতের কৃষিজ ফসল ব্রিটেনের স্বার্থে উৎপাদন হবে।

সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে ভারতের শিক্ষিত জনগণ ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যেও জোট বাঁধলেন। ইংরেজি শিক্ষা, সরকারি চাকরি পেলেও দেশীয় সমাজে শিক্ষিত জনগণ নিজেদের মতো

করে নিজেদের দাবিগুলি নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন। সেই চর্চা থেকে ইতিহাসও বাদ পড়ল না। মিলের ইতিহাসের যুক্তিকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্লেষণের বিপক্ষে ব্যবহার করা শুরু হলো। খোঁজা হলো প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, মধ্যযুগের ইতিহাস। দেখা গেল যেভাবে ব্রিটিশরা বলে ভারতের ইতিহাস নেই, তা ঠিক নয়। ইতিহাস আছে, শুধু বিভিন্ন উপাদান থেকে

গান্ধিকে নিয়ে এই ধরনের ছবি উত্তর ভারতে একসময় খুব ছাপা হতো। ছবিটিতে গান্ধিকে ভারতমাতার ও হিন্দু ধর্মের রক্ষক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের ইতিহাস জানতে এ ধরনের ছবি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

তাকে চেহারা দিতে হবে। সেই যে বঙ্কিম বলেছিলেন, আমি, তুমি সবাই ইতিহাস লিখব; সেই কাজটা শুরু হয়ে গেল।

দেশের মানুষ যখন দেশের ইতিহাস লিখলেন, তখন বিভিন্ন ঘটনার অন্য বিশ্লেষণ হাজির হলো। সাম্রাজ্যের স্বার্থের উলটোদিকে দেশের চিন্তাও ইতিহাসে জায়গা পেতে শুরু করল। সিরাজ উদ-দৌলা নিরীহ ব্রিটিশ কর্মচারীদের হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছিলেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক। ভারতীয় ঐতিহাসিক অঙ্ক কষে, যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন সেই অভিযোগ মিথ্যা। ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে পড়ল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশীয় তথা জাতীয়তাবাদী বিশ্লেষণের দ্বন্দ্ব।

আগামী এক বছরে ইতিহাসের তথ্য, তত্ত্ব, ধারণার পাশাপাশি এই দ্বন্দ্বগুলোও চোখে পড়বে এই বইয়ের নানাস্তরে। তাঁর সঙ্গে প্রায় ২৫০ বছরের কালপর্বে কীভাবে বদলে গেল ভারতের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ও মানুষের জীবনযাত্রা তার হদিশও পাওয়া যাবে। আস্তে আস্তে দেখা যাবে, ইতিহাস যেন আর দূরে থাকছে না। ঢুকে পড়ছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে বর্তমানকেও। পরিবারের একটু বয়স্ক অনেক সদস্যই সেই ইতিহাসের মধ্যে নিজেদের খুঁজে পাবেন। তাঁদের অভিজ্ঞতাই চারিয়ে যাবে বর্তমানে।

প্রশ্নটা, তার পরেও থেকে যায়, কেন পড়ব এত ইতিহাস? কেন জানব পুরোনো দিনের কথা? একটা গল্প বলা যাক। একদিন একটা রেল স্টেশনে দু-জন ব্যক্তির দেখা হলো। হঠাৎই। ট্রেন দেরি

করেছিল আসতে তাই কথা বলছিলেন তাঁরা। কথা বলতে বলতে একসময়ে জানা গেল তাঁরা দু-জন একই পরিবারের মানুষ। তাঁদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু অনেক দিন আগে দুটো পরিবার আলাদা হয়ে গিয়েছিল। আর কোনো যোগাযোগ ছিল না পরিবারদুটোর মধ্যে। আজ আর তাই তাঁরা একে অন্যকে আপনজন বলে চিনতে পারেননি।

গল্পটা যদি বাস্তব করে নেওয়া হয়? স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দুটো রাষ্ট্র একসময়ে ভারতবর্ষেরই আত্মীয় ছিল। দীর্ঘদিন তারা পাশাপাশি ছিল। অথচ একসময়ে তারা আলাদা হয়ে গেল। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার বাঁধন গেল আলাদা হয়ে। আজ তারা একে অন্যকে আত্মীয় বলে চিনতে পারে

না। নিজের ফেলে আসা আত্মীয়তাকে নতুন করে চিনে নেওয়ার জন্যই ইতিহাস পড়তে হয়। কেমন করে আত্মীয়রা আলাদা হয়ে গেল, তা বুঝতে হলে ইতিহাস পড়তে হবে।

পাশের ফটোগ্রাফটি দেশভাগের যন্ত্রণা ও নতুন ঠাঁই খোঁজার সংশয়দীর্ণ মানুষের ছবি। ছবিতে ব্যক্তিদের (পুরুষ ও নারী) চোখের ভঙ্গি থেকেই তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছে।

২ আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব মারা যান। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান। এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র

উপরের ছবিটির বাঁ-দিকের অংশে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব বসে আছেন। ডানদিকের অংশে রয়েছে লর্ড কর্নওয়ালিসের একটি মূর্তি। ঔরঙ্গজেবের ছবিটির ও কর্নওয়ালিসের মূর্তিটির ভঙ্গির মধ্যে কী কোনো তফাৎ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

৫০ বছরের। কিন্তু এই ৫০ বছরে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পরে খুব দ্রুত মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিও নষ্ট হতে থাকে। ফলে মুঘলদের পক্ষে তাদের সাম্রাজ্য ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই মুঘলদের এই অবনতিকে বিভিন্ন সম্রাটের ব্যক্তিগত দক্ষতা-ব্যর্থতা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়। যদিও একটা সাম্রাজ্য তথা শাসনব্যবস্থা

কর্নওয়ালিস দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে রোমান পোশাক। কেন কর্নওয়ালিসের মূর্তি বানানোর সময় তাঁকে রোমান পোশাক পরানোর কথা ভাবা হলো? ভাবো— একটা সূত্র দেওয়া রইল : রোমান সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

শুধু ব্যক্তি-সম্রাটের দক্ষতা- যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না । তাহলে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে মুঘলদের সাম্রাজ্যিক অবনতিকে?

সম্রাট জাহাঙ্গির ও শাহ জাহানের সময় থেকেই মুঘল শাসন কাঠামোয় ছোটোবড়ো সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে, বিশেষত শেষ দিকে মুঘল সাম্রাজ্যের কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা সেই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বরং, তাঁদের নানা অযোগ্যতার ফলে সেই দুর্বলতাগুলো আরও বেশি মাথা চাড়া দিয়েছিল। মুঘলদের সামরিক ব্যবস্থার অবনতি তেমনই

একটা দুর্বলতা ছিল। বিশেষ কোনো সামরিক সংস্কার অষ্টাদশ শতকের মুঘল সম্রাটরা করেননি। ফলে, সাম্রাজ্যের ভিতরের বিদ্রোহ হোক আর বাইরের আক্রমণ, দুর্বল সামরিক ব্যবস্থা সেসবের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। শিবাজী ও মারাঠাদের আক্রমণ মুঘল শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করেছিল। অন্যদিকে নাদির শাহের নেতৃত্বে পারসিক আক্রমণে (১৭৩৮-৩৯ খ্রি:) বা আহমদ শাহ আবদালির নেতৃত্বে আফগান আক্রমণে (১৭৫৬-৫৭ খ্রি:) দিল্লি শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পাশাপাশি, জায়গিরদারি ও মনসবদারি ব্যবস্থার সংকট মুঘলদের শাসন কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে। বিশেষত ভূমি রাজস্বের হিসেবে নানা গরমিল

দেখা দেয়। এর নেতিবাচক প্রভাব সাম্রাজ্যের অর্থনীতির উপরেও পড়েছিল। তাছাড়া ভালো জায়গির পাওয়ার জন্য দলাদলি মুঘল দরবারের অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে। দুর্বল সম্রাটেরা এক একটি অভিজাতপক্ষকে নিজের দলে টানার চেষ্টা করতেন। সব মিলিয়ে সম্রাট ও অভিজাতরা সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার বদলে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির প্রতি বেশি মনোযোগী হন।

সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের গরমিল বাস্তবে চাপ তৈরি করেছিল কৃষি ব্যবস্থার উপর। সেই চাপের বিরুদ্ধে একাধিক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসবের ফলে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শাসন

কাঠামোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিগুলি একএকটি অঞ্চলে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। তবে ঐ শক্তিগুলি সরাসরি মুঘল কর্তৃত্ব অস্বীকার করেনি। বরং মৌখিকভাবে মুঘল কর্তৃত্বের বৈধতাকে সকল আঞ্চলিক শক্তিই মেনে চলত। নিজেদের শাসনকে মান্যতা দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক শাসকেরা মুঘল সম্রাটের অনুমোদন চাইত। এমনকি অনেক আঞ্চলিক রাজ্যই নিজেদের প্রশাসনকে মুঘল প্রশাসনের ছাঁচেই গড়ে তুলেছিল। বাস্তবে অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান একধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল। তাই মুঘল শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হলেও, মুঘল রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে

পড়েনি। বরং আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে তা টিকেছিল।

আঞ্চলিক শক্তিগুলি ছিল বিভিন্ন রকমের। তার কোনোটা প্রতিষ্ঠা করেছিল বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত আঞ্চলিক প্রশাসকেরা। পাশাপাশি এমন কিছু রাজ্যও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে, যারা আগে মুঘল রাষ্ট্রের অধীন কিন্তু স্বশাসিত ছিল। আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে তিনটি শক্তি ছিল প্রধান। সেগুলি হলো বাংলা, হায়দরাবাদ ও অযোধ্যা। এই তিনটি আঞ্চলিক শক্তির প্রধান ছিলেন তিনজন মুঘল প্রাদেশিক প্রশাসক। তাঁরা কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিরোধিতা করেননি। যদিও নিজেদের অঞ্চলে তাঁদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল প্রায় চূড়ান্ত।

বাংলা

সুবা বাংলার রাজস্ব ঠিকমতো আদায় করার জন্য মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার দেওয়ান হিসেবে পাঠিয়েছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব। সম্রাট বাহাদুর শাহর আমলেও মুর্শিদকুলি ঐ পদে বহাল ছিলেন। দেওয়ান পদে মুর্শিদকুলির নিয়োগ পাকাপাকি করে দেন সম্রাট ফাররুখশিয়র। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলিকে বাংলার নাজিমপদ দেওয়া হয়। ফলে দেওয়ান ও নাজিমের যৌথ দায়িত্ব পাওয়ার জন্য সুবা বাংলায় মুর্শিদকুলির ক্ষমতা চূড়ান্ত হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বাংলার উত্থান ঘটে মুর্শিদকুলি খানের নেতৃত্বে।

টুকরো কথা

মুর্শিদকুলি খান-কে ঔরঙ্গজেবের চিঠি

সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর মুনশি ইনায়েতউল্লাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলিকে পাঠিয়ে ছিলেন। সেই চিঠিগুলি থেকে বাংলার দেওয়ানের প্রতি মুঘলসম্রাটের মনোভাব বোঝা যায়। মূল চিঠিগুলি ফারসিতে লেখা। তেমনই একটি চিঠিতে লেখা হয়েছিল:

‘‘বাদশাহের আজ্ঞা অনুসারে লিখিত হইতেছে যে— এখন বিহার প্রদেশের দেওয়ানের পদও আপনাকে অর্পণ করা হইয়াছে, সুতরাং আপনি স্বয়ং উড়িষ্যা যান ইহা ভাল নহে। তথায় এক প্রতিনিধি (নায়েব) রাখিয়া জাহাঙ্গীর-নগর

(ফিরিয়া) আসিবেন, কারণ যুবরাজ (আজীম্-উশ্-শান্) কুমার (ফরোখ্সিয়রকে ঢাকায়) রাখিয়া নিজে পাটনা চলিয়া গিয়াছেন। আপনার অনেক কার্য্য, সুতরাং যথা হইতে সব স্থানের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন এরূপ কেন্দ্রস্থানে আপনার বাস করা উত্তম।.... বাদশাহ হুকুম করিতেছেন যে— উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশ (সুবা), এক কোণে স্থিত। সর্ব্বদাই ইহার পৃথক শাসনকর্ত্তা থাকিত, এবং আপনার কার্য্যস্থলের (বাঙগলার) সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। এই প্রদেশের অবস্থা লিখিয়া জানাইবেন।" জাহাঙগীরনগর বলতে ঢাকা বোঝানো হয়েছে। আরেকটি চিঠিতে লেখা হয়েছে:

‘‘ইতিপূর্ব্বে বাদশাহের হুকুমে এই মন্ত্রীবরকে লেখা হইয়াছে যে প্রায় নব্বই লক্ষ টাকার সরকারী খাজনা যাহা বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং যাহার পরিমাণ আপনি বাদশাহকে লিখিয়া জানাইয়াছেন, ও তৎসঙ্গে অন্যান্য অধিক টাকা যাহা সংগ্রহ হইয়া থাকিবে, একত্রে যত দ্রুত সম্ভব এখানে পাঠাইবেন।..... যদি আপনি পূর্ব্বে প্রেরিত আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বোক্ত টাকা সদরে রওনা করিয়া থাকেন, ভালই; নচেৎ এই পত্র পাইবামাত্র ঐ টাকা এবং অপর যাহা-কিছু আদায় হইয়াছে তাহা সমস্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুততার সঙ্গে হুজুরে প্রেরণ করিবেন। জানিবেন যে বিলম্ব অবৈধ, কারণ এ বিষয়ে বাদশাহ অত্যন্ত অধিক তাকিদ

করিতেছেন। নিশ্চয়ই এই আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন।”

এই চিঠিটির থেকে ঔরঙ্গজেবের শেষ কয়েক বছরের রাজত্বকালে টাকার অভাব এবং সুবা বাংলা থেকে পাঠানো রাজস্বের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আরেকটি চিঠিতে মুর্শিদকুলিকে লেখা হয়েছে:

“আপনি বাদশাহী রাজস্ব সংগ্রহে ..... পরিশ্রম করিতেছেন, ... এবং প্রার্থনা করিয়াছেন যে বাদশাহের স্বহস্তে লিখিত কয়েক ছত্র সহ এক ফর্ম্মান আপনার নামে প্রেরিত হউক, তাহা সব বাদশাহ অবগত হইলেন। সম্রাট অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাকে এক উজ্জ্বল সম্মানসূচক পরিচ্ছদ (খেলাৎ)

এবং স্বহস্তাক্ষরে ভূষিত ফর্মান প্রদান করিলেন।

নিশ্চয়ই এই সব অনুগ্রহের জন্য

ধন্যবাদ প্রকাশ করিতে ও রাজস্ব সংগ্রহ ও হুজুরে প্রেরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত পরিশ্রম করিবেন। ..... অতি শীঘ্র খেলাৎ ও ফর্মান আপনার নিকট প্রেরিত হইবে।”

[উদ্ধৃত চিঠির অংশগুলি মূল ফারসি থেকে বাংলায় তরজমা করেছিলেন যদুনাথ সরকার। তাঁর ‘মুর্শীদ কুলী খাঁর অভ্যুদয়’ প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে (মূল বানান অপরিবর্তিত)।]

মুর্শিদকুলির আমলে বাংলায় একদল ক্ষমতাবান জমিদারশ্রেণি তৈরি হয়। তাঁরা নাজিমকে নিয়মিত রাজস্ব দেওয়ার বদলে নিজেদের অঞ্চলে ক্ষমতা ভোগ করতেন। মুর্শিদকুলির আমলে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যবসার পক্ষে অনুকূল ছিল। স্থল ও সমুদ্রপথে নানান দ্রব্য সুবা বাংলা থেকে রফতানি করা হতো। হিন্দু, মুসলমান ও আর্মেনীয় বণিকরাই ঐ ব্যবসায় প্রভাবশালী ছিল। হিন্দু ব্যবসায়ী উমিচাঁদ ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খোজা ওয়াজিদ ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। এইসব ধনী ব্যবসায়ী ও মহাজনদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল।

শাসকেরা এদের সহায়তার ওপর নির্ভর করত। এ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মূলধন বিনিয়োগকারী জগৎ শেঠের নাম করা যায়। সুবা বাংলার কোশাগার ও টাঁকশাল জগৎ শেঠের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণেই চলত।

মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলি খান-প্রতিষ্ঠিত কাটরা মসজিদ। মূল ছবিটি উইলিয়ম হজেস-এর আঁকা(১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ)।

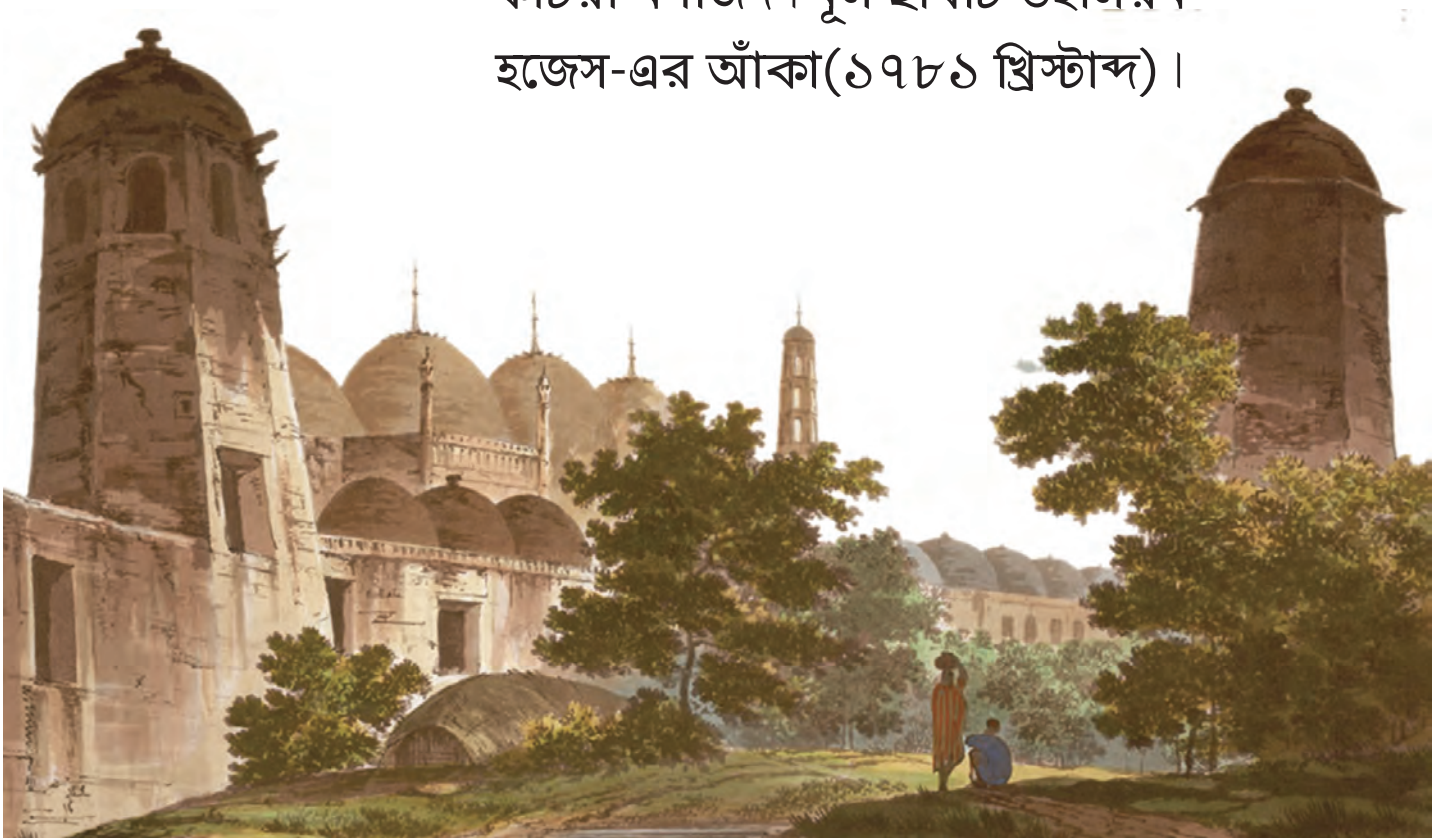

টুকরো কথা

জগৎ শেঠ

মুর্শিদাবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বণিকদের বেশ প্রভাব ছিল। এদের বণিকরাজা বলা হতো। এই বণিকরাজাদের মধ্যে প্রবীণ ছিলেন উমিচাঁদ, খোদা ওয়াজিদ এবং জগৎ শেঠ। মুর্শিদাবাদে সিরাজ-বিরোধী উদ্যোগে জগৎ শেঠ-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে রাজস্থান থেকে হিরাপদ শাহ পাটনায় চলে যান। তাঁর বড়ো ছেলে মানিকচাঁদ ঢাকায় মহাজনি কারবার শুরু করেন। মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে মানিকচাঁদের সম্পর্ক ভালো ছিল। সেই সূত্রেই মানিকচাঁদ ঢাকা ছেড়ে মুর্শিদাবাদে ব্যবসা শুরু করেন। মানিকচাঁদের পর তাঁর ভাগ্নে ফতেহচাঁদ

ব্যবসার হাল ধরেন। ফতেহচাঁদ মুঘল সম্রাটের থেকে জগতের শেঠ বা জগৎ শেঠ উপাধি পান। সেই উপাধি বংশানুক্রমিক ভাবে চলতে থাকে। **অর্থাৎ জগৎ শেঠ কোনো একজনের নাম নয়, নির্দিষ্ট একটি বণিক পরিবারের উপাধি।**

নিজেদের মুদ্রা তৈরি, মহাজনি ব্যবসা প্রভৃতির ফলে জগৎ শেঠের বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল। এক ধরনের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল জগৎ শেঠদের হাত ধরে। অর্থাৎ বাংলায় অর্থনীতির উপর জগৎ শেঠদের নিয়ন্ত্রণ ছিল যথেষ্ট। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে বাংলার নবাবের দরবারেও তাদের প্রভাব ছিল। ফলে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও সিরাজ-বিরোধী উদ্যোগে